একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)
An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

A Comparative Analysis of the Personal lives, Personalities, and Indian philosophical thought of ĀcāryaŚaṅkara and SwāmīVivekānanda

আচার্য শঙ্কর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় দর্শন চিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

Name of the Author: Rupam Dutta
Affiliation: Ph.D. Research Scholar, Department Of Sanskrit, University Of Calcutta

Abstract: One of the greatest sons of India, ĀcāryaŚaṅkara and another greatest son, SwāmīVivekānanda, were unique representatives of two different eras of Indian philosophy. ĀcāryaŚaṅkara was an 8th century Indian philosopher who gave a well-organized theoretical form to the ancient adwaitavedānta. And SwāmīVivekānanda was an inspiring great monk of the 19th century Renaissance who transformed this adwaitavedānta Philosophy into a human-centered and effective socio-moral philosophy. The thoughts and works of these great sages are not limited to the Philosophical sphere only, but have deeply influenced Indian thought through their Personal lives, Personalities, social Philosophical thoughts and Moral Philosophical thoughts, and continue to do so today and will continue to do so in the future. This research paper provides a comparative analysis of the Personal lives, Personalities, and Indian philosophical thought of ĀcāryaŚaṅkara and SwāmīVivekānanda. This research paper has five objectives, which are:- (1) To make a comparative analysis of the personal lives (body, talent, meditation, service to the mother, devotion to the Guru, altruism, enthusiasm, sacrifice, deep respect for various sages, many disciples, popular, disease, short life span) of ĀcāryaŚaṅkara and SwāmīVivekānanda. (2) To make a comparative analysis of the personalities (self-realization and self-expression, intelligence and emotions, leadership style, style of expression, concept of ideal man) of ĀcāryaŚaṅkara and SwāmīVivekānanda. (3) To make a comparative analysis of the Indian philosophical thoughts (Brahma, Jīva, Jagata, Māẏā, Mukti, Vedānta method of judgment, method of interpretation of various mantras of theupaniṣada& role of love in AdwaitaVedānta) of ĀcāryaŚaṅkara andSwāmīVivekānanda. (4) To highlight the relevance of the Indian philosophical thought of ĀcāryaŚaṅkara and SwāmīVivekānanda in modern Indian society. (5) To prove that philosophical thought is not just the result of abstract thinking, but also a kind of intellectual expression of personal life. Instead of viewing the thoughts of these two great sages - ĀcāryaŚaṅkara and SwāmīVivekānanda - as contradictory, it is more reasonable to consider them as two distinct streams of a unified philosophical stream. ĀcāryaŚaṅkara laid the basic foundation of philosophy there, while SwāmīVivekānanda gave that foundation a life-oriented and practical form. Therefore, the main idea that emerges from the comparative analysis of ĀcāryaŚaṅkara and SwāmīVivekānanda is that the real power of Indian philosophy lies in this mutual coordination of theoretical depth and its practical application.

Key Words -ĀcāryaŚaṅkara, SwāmīVivekānanda, Indian Philosophical thought, Personal lives, Personalities, Society

আচার্য শঙ্কর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় দর্শন চিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

রূপম দত্ত

(১) ভূমিকা:-

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান আচার্য শঙ্কর এবং অপর শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় দর্শনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনন্যসাধারণ প্রতিনিধি। আচার্য শঙ্কর ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিক, যিনি প্রাচীন অদ্বৈত বেদান্তকে একটি সুসংগঠিত তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীরনবজাগরণের এক অনুপ্রেরণাদায়ী মহান সন্ন্যাসী, যিনি এই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকে একটি মানবকেন্দ্রিক ও কার্যকর সামাজিক -নৈতিক দর্শনে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই মহান ঋষিদের ভাবনা-চিন্তা ও কর্ম কেবলমাত্র দার্শনিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক দর্শন-চিন্তা এবং নৈতিক দর্শনে-চিন্তার মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, এখনও করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।আলোচ্য গবেষণা পত্রে আচার্য শঙ্কর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় দর্শন চিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাটি করার সময়ে প্রথমেই কিছু গবেষণা প্রশ্ন উঠে এসেছে, সেগুলি হলো - (১) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন দিক নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ? এই বিষয়ে এদের মিল ও অমিল কোথায় কোথায় রয়েছে ? (২) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের কোন কোন দিক নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ? এনাদের ব্যক্তিত্বের গঠন কি এনাদের ভাবনা ও কর্মে কোন প্রভাব ফেলেছে ? (৩) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন ভাবনার কোন কোন দিক নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ? এনাদের এই বিষয়ে ভাবনার কি কি মিল ও অমিল রয়েছে? (৪) শঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন চিন্তা আধুনিক ভারতীয় সমাজে কতখানি প্রাসঙ্গিক রয়েছে? আলোচ্য গবেষণার চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলি হলো - (১) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের (দেহ, মেধাবী, ধ্যানপরায়ণ, মাতৃসেবা, গুরুভক্তি, পরোপকারপ্রবৃত্তি, উদ্যমশীল, ত্যাগী, বিভিন্ন মনীষীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বহু শিষ্য, লোকপ্রিয়, রোগ, স্বল্পায়ু) তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।(২) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের (আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ, বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ, নেতৃত্বের ধরণ, অভিব্যক্তি প্রকাশের ধরণ, আদর্শ মানবের ধারণা) তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা। (৩) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন ভাবনার (ব্রহ্ম, জীব, জগত, মায়া, মুক্তি, বেদান্ত বিচার পদ্ধতি, উপনিষদের বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যা পদ্ধতি, অদ্বৈত বেদান্তে প্রেমের ভূমিকা) তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা। (৪) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন চিন্তা আধুনিক ভারতীয় সমাজে কতখানি প্রাসঙ্গিক রয়েছে তা তুলে ধরা।(৫)

দর্শনভাবনা কেবল বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার ফল নয়, ব্যক্তিগত জীবনের এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক অভিব্যক্তি-ও - তা প্রমাণ করা।

(২) পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও এদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ সীমিত ও আংশিক পর্যায়ে হয়েছে।আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন চিন্তাকে নিয়ে কিছু আলোচনা হলেও তাদের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্বের ধরণ, ভারতীয় দর্শন চিন্তাকে নিয়ে একটি সামগ্রিক গবেষণা কাঠামোর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগে করা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে এই গবেষণা পত্রটি সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করেছে।

(৩) গবেষণা পদ্ধতি;-

আচার্য শঙ্কর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় দর্শন চিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ - এই গবেষণাটি করার জন্য প্রাথমিক তথ্য (আচার্য শঙ্করের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনা) ও গৌণ তথ্য (আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, সংবাদ পত্র ইত্যাদি) - এর উপর ভিত্তি করে বর্ণনামূলক পদ্ধতি (আচার্য শঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা, স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা), ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি (আচার্য শঙ্করের ব্যক্তিত্বের ও ভারতীয় দর্শন ভাবনার ব্যাখ্যা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের ও ভারতীয় দর্শন ভাবনার ব্যাখ্যা) এবং তুলনামূলক পদ্ধতি (আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় দর্শন ভাবনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ) - এর সমন্বয়ে গুণগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

(৪) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু দিক নিয়ে
তুলনামূলক বিশ্লেষণ করছি। যেমন –

(ক) দেহ:-

আচার্য শঙ্কর গৌরকান্তি, দীর্ঘকায়, সৌম্যমূর্তি, গম্ভীর, প্রসন্নবদন, স্থির, মিতভাষী, গৈরিক বস্ত্রধারী, মুণ্ডিতমস্তক, একদন্ডধারী সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শৈশব থেকেই স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ , স্মৃতিধর, যুক্তিবাদী, মেধাবী, কৌতুক প্রিয়, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, ব্যায়ামবীর, পরোপকারী, ধ্যানশীল, ভ্রমণপ্রিয় ও জ্ঞানান্বেষী ছিলেন।

(খ) মেধাবী:-

আচার্য শঙ্কর অসাধারণ শ্রুতিধর ছিলেন। এর কয়েকটি নিদর্শন হলো;- (অ) আচার্য পদ্মপাদ তার রচিত 'ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি' আচার্য শঙ্করকে যে পর্যন্ত শুনিয়েছিলেন, পরে তা বিনষ্ট হলে আচার্য শঙ্কর তা যথাযথ আবৃত্তি করেন ও আচার্য পদ্মপাদ তা লিখে নেন। (আ) কেরলাধিপতি রাজশেখর তার তিনখানি নাটক বিনষ্ট হয়ে গেছে বলে অত্যন্ত দুঃখ করলে আচার্য শঙ্কর পূর্বে শোনা সেই নাটকগুলির যথাযথ আবৃত্তি করেন ও কেরলাধিপতি রাজশেখর তদনুসারে তার লেখা সেই তিনখানি নাটক পুনরুদ্ধার করেন। অন্যদিকে স্বামী

বিবেকানন্দও ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তার স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর ছিল। তিনি যে বই পড়তেন তা থেকে পরে তিনি অবিকল বলতে পারতেন।

(গ) ধ্যানপরায়ণ:-

আচার্য শঙ্করের জীবনে ধ্যানপরায়ণতা পূর্ণ মাত্রায় যে বর্তমান তা বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে দেখা যায়; যেমন - (অ) শ্রীশৈলে উগ্রভৈরব যখন আচার্য শঙ্করের কাছে তার মস্তক ভিক্ষা করে, তখন তিনি শিষ্যগণকে লুকিয়ে একটি নিভৃত স্থানে সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। আচার্য শঙ্করের এই কার্যের উদ্দেশ্য হলো যে যেন কাপালিক সহজে তাকে বলী দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে। এখানে আচার্য শঙ্করের সমাধি অভ্যাসের এরূপ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যে একজন তার মস্তক ছেদন করবে তবুও তিনি তা জানতে পারবেন না। (আ) শুভগণবরপুরে আচার্য শঙ্করের ধ্যানপরায়ণতার বেশ স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যেখানে শিষ্যগণকে দিগ্বিজয় কার্যে আদেশ দিয়ে তিনি স্বয়ং ধ্যানে অনেক সময় ধরে রত থাকতেন। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ বাল্যকালে রামসীতার মূর্তির সামনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অনেক সময় ধরে বসে থাকতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বাল্যকালে বন্ধুদের সাথে ধ্যান ধ্যান খেলার সময় একটি সাপ এসে হাজির হলে তার বন্ধুগন পালিয়ে গেলেও তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে অনেক সময় ধরে বসে ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরকালেও তার ধ্যান পরায়ণতার বহু বহুদৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই।

(ঘ) মাতৃসেবা:-

আচার্য শঙ্কর সাত বছর বয়সে গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে অনান্য কর্মের সাথে মাতৃসেবাতেও রত থাকতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় আচার্য শঙ্কর তার মায়ের ভার আত্মীয়দের উপর দিয়ে যান।আচার্য শঙ্কর তার মায়ের অন্তিম সময়ে মায়ের কাছে এসে মায়ের সেবা করেছিলেন। তিনি সন্নাসী হয়েও মায়ের সৎকার করেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও তার অসীম মাতৃসেবা দেখা যায়। মায়ের বাড়ি রক্ষার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ সন্নাসী হয়েও বিচারালয়ে পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

(ঙ) গুরুভক্তি:-

আচার্য শঙ্করের গুরুভক্তির কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল- (অ) আচার্য শঙ্কর তার গুরুদেব গোবিন্দপাদের গুহা প্রদক্ষিণ করতেন। (আ) আচার্য শঙ্কর তার গুরুদেব গোবিন্দপাদের চরণ পূজা করতেন। (ই) আচার্য শঙ্কর তার গুরুদেব গোবিন্দপাদের সমাধির বিঘ্ননিবারণের জন্য নর্মদার জলরোধ করেছিলেন। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে মাদ্রাজীদের কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন যে তিনি তার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাস; তারই দূত হয়ে তিনি তার মঙ্গলবার্তা সমগ্র জগৎকে বলেছেন। আমরা দেখতে পাই যে স্বামী বিবেকানন্দের অপরিসীম গুরুভক্তি ছিল।

(চ) পরোপকারপ্রবৃত্তি:-

আচার্য শঙ্করের জীবনে পরোপকারপ্রবৃত্তির কয়েকটি দুষ্টান্ত উল্লেখ করা হল; যেমন - (অ) বাল্যকালে এক ব্রাহ্মণীর আমলকি ফল ভিক্ষারূপ কর্ম দেখে সেই ব্রাহ্মণীর দুঃখমোচনের জন্য তিনি ধন-সম্পত্তির দেবী মাতা

লক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। (আ) শ্রীশৈলে উগ্রভৈরবের প্রার্থনানুসারে আচার্য শঙ্কর নিজ মস্তক তাকে প্রদান করতে সম্মত হয়েছিলেন। এতে উগ্রভৈরবের ইষ্টসিদ্ধি হবে- এই ছিলো তার মস্তকদানে সম্মতির কারণ ইত্যাদি। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ বৈদ্যনাথে থাকাকালীন রাস্তায় কষ্ট পাওয়া এক আমাশয় রোগীকে শুশ্রুষা করেছিলেন। তিনি কলকাতায় প্লেগ রোগীদের সেবা করেছিলেন ইত্যাদি।

(ছ) উদ্যমশীল:-

আচার্য শঙ্করের জীবনের উদ্যমশীলতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল - (অ) গুরু গোবিন্দপাদের শিষ্য হওয়ার জন্য তিনি তার কাছে গিয়েছিলেন। (আ) নিরিবিলিতে ভাষ্য রচনার জন্য তিনি বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন। (ই) ব্যাসদেবের আদেশে তিনি কুমারিল আচার্যের কাছে গিয়েছিলেন। (ঈ) তিনি মণ্ডন মিশ্রের কাছেও গিয়েছিলেন। (উ) তিনি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছিলেন ইত্যাদি।অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার বিশ্বধর্মসম্মেলনে গিয়ে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। বিদেশের আরও বহু জায়গাতেও তিনি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করের মতো সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার লিখিত রূপ, তার লেখা ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ পড়লে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে স্বামী বিবেকানন্দ কীভাবে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সাধারণ মানুষকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন; যেন তারা আলস্য ত্যাগ করে পরার্থে কর্মের পথে এগিয়ে যান - এই ছিল আমাদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের এক অতি গভীর বার্তা; যা এখনও অতি প্রাসঙ্গিক।

(জ) ত্যাগী:-

আচার্য শঙ্কর শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে যখন ছিলেন তখন ভিক্ষা করে যা পেতেন তা তিনি নিজ গুরুচরণেই নিবেদন করতেন । তারপরে তিনি গুরুগৃহ থেকে যখন নিজের পৈতৃক গৃহে পুনরায় ফিরে এসেছিলেন তখন কেরলাধিপতি রাজশেখর বহু ধন সম্পত্তি তাকে দান করতে প্রবৃত্ত হলে তিনি তা সন্মানের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তিনি কেরলাধিপতিকেই সেই ধন-সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে বলেছিলেন। আচার্য শঙ্কর নিজগৃহ, সংসার ত্যাগ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দও স্বগৃহ, সংসার পরিত্যাগ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

(ঝ) বিভিন্ন মনীষীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন:-

স্বামী বিবেকানন্দ জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। পরন্তু কখনও কখনও এই শ্রদ্ধা পূজার পর্যায়ে চলে গেছে, তা বলাই যায়।' জগতের মহত্তম আচার্যগণ' শীর্ষক একটি ভাষণে তিনি যীশুখ্রিস্ট মহম্মদ, ভগবান বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিদের চরিতামৃত কীর্তন করেছেন।এই বিভিন্ন মনীষীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন বিষয়ে আচার্য শঙ্কর শুধু যে তিনি নীরব হয়ে রয়েছেন তা নয়, পরন্তু সময়ে সময়ে তিনি বিভিন্ন মনীষী সম্বন্ধে খড়গহস্তও বটে, সম্ভবত তাঁর সেই সময়ে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্যই এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু একে কোন ভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

(ঞ) বহু শিষ্য:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েরই ধনী গরিব নির্বিশেষে বহু সন্ন্যাসী ও গৃহস্ত উভয় প্রকার শিষ্যই ছিল। বৌদ্ধ, জৈন, দুরাচারী, সুরাপায়ী, কাপালিকগণ সহ বহুসংখ্যক ব্যক্তি আচার্য শঙ্করের আশ্রয় পেয়েছিল, তার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

(ট) লোকপ্রিয়:-

আচার্য শঙ্করের জীবনে লোকপ্রিয়তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল; - (অ) আচার্য শঙ্করের দিগ্বিজয়সময়ে বহু সহস্র ব্যক্তি তার অনুগমন করেছিলেন। (আ) আচার্য শঙ্করের ভগন্দর রোগের সময় গৌড় দেশীয় রাজবৈদ্যগণ ভীষণ যত্ন- সহকারে তার সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। স্বামী বিবেকানন্দকে চেনে না বিশ্বে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

(ঠ)রোগ:-

আচার্য শঙ্করের শরীরে একমাত্র ভগন্দর রোগের কথা শুনা যায়। অবশ্য এটা অভিনবগুপ্তের অভিচার ক্রিয়ার কারণেই হয়েছিল। এ ছাড়া আচার্য শঙ্করের আর অন্য কোন রোগের কথা শোনা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের হাঁপানি, মাইগ্রেন, ডায়বেটিস, হৃদরোগ ইত্যাদি রোগ ছিল।

(ড) স্বল্পায়ু:-

শঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই স্বল্পায়ু ছিলেন। শঙ্করাচার্য মাত্র বত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দও মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন।

(৫) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:-

আচার্য শঙ্কর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের কিছু দিকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করছি। যেমন -

(ক) আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ:-

আচার্য শঙ্করের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু হলো আত্মোপলব্ধি। তিনি নিজের অন্তরে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাকেই সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসেবে দেখতেন। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব হলো আত্মপ্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দ নিজের উপলব্ধিকে তার বিশাল কর্মযজ্ঞ, সংগঠন, অসাধারণ বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

(খ) বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ:-

আচার্য শঙ্করের ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রধান দিক হলো তার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি। শাস্ত্র অধ্যয়ন, গভীর বিশ্লেষণ ও ক্ষুরধার বিচার হলো তাঁর প্রধান অস্ত্র। এখানে আবেগ নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রখর বুদ্ধি ও তীব্র আবেগের এক অসামান্য সংমিশ্রণ। তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা ও অসামান্য রচনায় যেমন যুক্তি রয়েছে, তেমনই রয়েছে তীব্র আবেগ ও অসীমঅনুপ্রেরণা। তাই অতি অবশ্যই বলা যায় যে আচার্য শঙ্কর হলেন 'জ্ঞানের নির্মাতা', আর স্বামী বিবেকানন্দ হলেন 'সেই জ্ঞানের প্রচারক ও অনুপ্রেরণাদাতা'।

(গ) নেতৃত্বের ধরণ:-

আচার্য শঙ্করের নেতৃত্ব তার আধ্যাত্মিক ও প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন, গভীর বিশ্লেষণ ও ক্ষুরধার বিচারের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতেন। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্ব ছিল আকর্ষণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি মানুষকে অনুপ্রাণিত, সংগঠিত এবং বিশাল কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত করেছেন।

(ঘ) অভিব্যক্তি প্রকাশের ধরণ:-

আমরা আচার্য শঙ্করের সংক্ষিপ্ত, গুরুগম্ভীর এবং শাস্ত্র নির্ভর ভাষা প্রধানত দেখতে পাই, যেখানে গভীরতা তুলনামূলক বেশি, বরং সহজ-সরল ভাবে বোধগম্যতা তুলনামূলক কম। অপরদিকে, আমরা সাধারণত স্বামী বিবেকানন্দের সরল, প্রাণবন্ত এবং অনুপ্রেরণাদায়ক ভাষা দেখতে পাই, যা সাধারণ মানুষের হৃদয়কেও সহজে স্পর্শ করে।

(ঙ) আদর্শ মানবের ধারণা:-

আচার্য শঙ্করের মতে, আদর্শ মানব হলেন জ্ঞানী ব্যক্তি - যিনি মায়াকে অতিক্রম করে ব্রহ্মে বিলীন হয়েছেন। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের মতে, আদর্শ মানব হলেন "মানবতায় পরিপূর্ণ কর্মযোগী" - যিনি নিজের অন্তরের দেবত্বকে উপলব্ধি করে সমাজসেবায় গভীরভাবে নিযুক্ত থাকেন।

(৬) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন চিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন ভাবনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করছি। যেমন -

(ক) ব্রহ্ম:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ - উভয়ের ব্রহ্ম বিষয়ে ভাবনার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক থাকলেও তাঁদের এই বিষয়ে ব্যাখ্যা পৃথক দার্শনিক অভিমুখের ইঙ্গিত দেয়। আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হলো অদ্বিতীয় চরম সত্তা; যা নির্গুণ, নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, অনিরুপিত, অপরিবর্তনীয়, অবিভাজ্য, অক্ষয় ও শাশ্বত ইত্যাদি। মায়ার কারণেই এই জগতকে সত্য বলে মনে হয়। জগতের ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও এর পারমার্থিক সত্যতা নেই। মানবাত্মা ও ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষেই অভিন্ন। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তকে কেবল অধিবিদ্যার স্তরে না রেখে তাকে মানবজীবনের কেন্দ্রে উন্নীত করেছেন। ফলে, ব্রহ্ম আর কোনো দূরবর্তী, বিমূর্ত সত্য নয়; এটি এক জীবন্ত, সক্রিয় এবং রূপান্তরকারী শক্তিতে পরিণত হয়ে ওঠে। মানুষই হলো ব্রহ্মের প্রধান বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্র। সকল মানুষের অন্তরেই এক অন্তর্নিহিত দেবত্ব রয়েছে। ধর্মের কাজ কোন ভাবেই বাইরে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা নয়, বরং তার কাজ হলো মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তোলা। এর ফলে মানব-মর্যাদা এক আধ্যাত্মিক ভিত্তি লাভ করে। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দার্শনিক যুক্তি উপস্থাপিত হয়। মানুষকে সেবা করলে তা ঈশ্বরেরই সেবা হবে - এরূপ ধারণা থেকেই "দরিদ্র-নারায়ণ সেবা" ইত্যাদি কর্মযজ্ঞের ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্ব-জগৎকে অস্বীকার করেন না। উপরন্তু তিনি বলেন যে এই বিশ্ব-জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশস্থল। তাই সংসারকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়, বরং এই সংসারের ভিতরেই সাধনা করা উচিত। কর্ম, সম্পর্ক, সংগ্রাম - এগুলোই হলো আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্র। বিভিন্ন কর্ম, সেবা, শিক্ষাদান -

এগুলো আর "সামান্য কর্ম" থাকে না, বরং তা ব্রহ্ম উপলব্ধির মাধ্যম হয়ে ওঠে।এই কর্ম আর কোন ভাবেই বন্ধন নয়, বরং সচেতনভাবে করলে তা মুক্তির পথ প্রদর্শন করবে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই ব্রহ্ম হলো অসীম শক্তির আধার। এই অসীম শক্তি জগতে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হচ্ছে ও সেই শক্তির সচেতন কেন্দ্র হলো মানুষ। যদি প্রত্যেকেই ব্রহ্মের প্রকাশ হয় তাহলে কাউকে অবমাননা করা মানে স্বয়ং ব্রহ্মকেই অবমাননা করা হবে।ধর্ম কোন ভাবেই কেবল মন্দির বা ধ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত বেদান্তকে তিনটি স্তরে পুনর্গঠন করেছেন: (অ) তাত্ত্বিক - সকল কিছুই হলো ব্রহ্ম, (আ) অনুভবমূলক - সকল কিছুই যে ব্রহ্ম মানুষের তা অনুভব হয়, (ই) ব্যবহারিক - দৈনন্দিন জীবনে এর প্রকাশ করা হয়। এই ত্রি-স্তরীয় গঠনই অদ্বৈত বেদান্তকে একটি "জীবন্ত দর্শন" করে তুলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের এই 'ব্রহ্মচিন্তা' অদ্বৈত বেদান্তকে নিছক 'জানার বিষয়' থেকে 'হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া'-য় রূপান্তরিত করে। ব্রহ্ম আর কোনো দূরবর্তী, নিষ্ক্রিয় সত্য নন। এটি মানব হৃদয়ের অন্তরের এক সক্রিয় শক্তি, যা জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তাই অতি অবশ্যই বলছি যে, এইভাবে এখানে অদ্বৈত বেদান্ত নিছক একটি তত্ত্ব নয়, বরং জীবনযাপনের একটি পদ্ধতি (A way of life) হয়ে উঠেছে; যা আমাদের অতি অবশ্যই মানতে হবেই।

(খ) জীব:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ - উভয়ের জীব বিষয়ে ভাবনার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক থাকলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন। আচার্য শঙ্করের মতে জীব প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে "অহং ব্রহ্মাস্মি"। (1.4.10) অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম হই"। এই যে আমাদের পৃথক পৃথক জীবসত্তা বলে বোধ হয় তা প্রকৃত পক্ষে মায়ার কারণেই হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে জীবের স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণভাবে বিভ্রম বা ভ্রান্ত নয়; অধিকন্তু এটি হল বিকাশের ক্ষেত্র। এই যে স্বতন্ত্রতা তাকে স্বীকার করে, তাকে আরো উন্নত করে দেবত্বে উপনীত হতে হবে। সকল জীবের অন্তরে যে অনন্ত শক্তি ও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তার অতি অবশ্যই সাধনা, প্রেম ও কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। এখন অতি অবশ্যই বলতে হবে যে যদি জীব শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মেই বিলীন হয়, তাহলে জীবের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও সৃজনশীল উদ্যম কি অর্থহীন হয়ে যাবে? অন্যদিকে জীবের প্রকাশই যদি মুখ্য হয়, তাহলে অদ্বৈত বেদান্ত মতে এই যে অভেদ তত্ত্ব তা কি শুধুই আদর্শিক ধারণা হয়ে থেকে যাবে? তাই আমার মতে জীব হলো বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বা অনুভব, শক্তির প্রকাশ বা বিকাশ এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদের এক অবিচ্ছিন্ন যাত্রা। সহজভাবে বললে বস্তুত পক্ষে জীব যেমন তেমন ভাবেই বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়াই জীব।

(গ) জগত:-

শঙ্করাচার্য "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" - এরূপ বলে ব্যাবহারিক জগৎকে অবিদ্যা কল্পিত বলে স্বীকার করেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তা করেন নি। স্বামী বিবেকানন্দ জগতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্বকে অতি অবশ্যই স্বীকার করেছেন। এ বিশ্ব-জগতে যা কিছু দেখা, শোনা যায়, স্পর্শ, অনুভব করা যায়, সেই সকলকেই ভগবানেরই সৃষ্টি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী

বিবেকানন্দের মতে এই বিশ্ব-জগৎ ভগবানের নিবাস স্থল। ফলে ব্যবহারিক জগৎকে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করেই তিনি ব্যবহারিক বেদান্তকে জগতে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(ঘ) মায়া:-

ভারতীয় দর্শনে "মায়া" হলো এক অতি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই এই মায়া তত্ত্বকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। আচার্য শঙ্করের মতে মায়া হলো ভুল ধারণা বা অবিদ্যার শক্তি। এই মায়া অতি অবশ্যই ব্রহ্মকে আবৃত বা আচ্চাদিত করে না, কিন্তু আমাদের বোধশক্তিকে আবৃত বা আচ্চাদিত করে, আর এর কারণে আমরা এই বিশ্বজগৎকে অতি অবশ্যই বাস্তব বলে ভাবি। এই মায়ার কারণেই আমাদের সত্য ও অসত্যের মিশ্রণে এক প্রকার মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি হয়; যেমন- "আমি দেহ", "আমি ফর্সা","আমি কালো","আমি পৃথক" প্রভৃতি। আচার্য শঙ্করের মতে এই মায়াশক্তিকে ভেদ করে মুক্তি লাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে মায়া কেবলই এক ভ্রম নয়, এটি হলো মানব অভিজ্ঞতার এক গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো, যার মাধ্যম দিয়ে আমরা মানুষেরা এই বিশ্বজগতকে উপলব্ধি করি। এই যে বিশ্বজগত তা অতি অবশ্যই মায়াময় হলেও সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন নয়, এই মায়া মানবাত্মার বিকাশক্ষেত্র। এই মায়াকেবল এখানে আচ্ছাদন নয়, এটি প্রকাশের মাধ্যমও হয়েছে। আচার্য শঙ্করের মতে মায়া হলো এক বাধা, আর স্বামী বিবেকানন্দের মতে সেই বাধাই হলো শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার এক সুযোগ। তাই আমরা বলতে পারি যে আচার্য শঙ্করের মতানুসারে মানুষ প্রথমে বুঝবে যে এই বিশ্বজগৎ চরম সত্য নয়, তারপর স্বামী বিবেকানন্দের মতানুসারে সেই গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে এই বিশ্বজগতে বিভিন্ন কাজ করবে।

(ঙ) মুক্তি:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের মুক্তি তত্ত্ব একই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন থেকে সম্ভূত হলেও তাদের এই মুক্তি-র দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োগে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। আচার্য শঙ্করের মতে কোন মানুষের মুক্তি সম্পূর্ণরূপে সেই ব্যক্তির নিজের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হয়, কোনপ্রকার বাহ্যিক বা সামাজিক শর্তাবলির উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু এ কথা অতি অবশ্যই বলতে হয় যে যদি এই মুক্তিকে কেবলই ব্যক্তিগত জ্ঞান হিসেবে ভাবা হয় তাহলে মানুষের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা (passivity) সৃষ্টি হবে, যা কাম্য নয়। সমাজে মানুষের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করার যে নৈতিকতা রয়েছে তার বাধ্যবাধকতা থাকবে না । স্বামী বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করের এই আত্মজ্ঞানকেন্দ্রিক মুক্তির ধারণাকে অতি অবশ্যই গ্রহণ করলেও তার সাথে সাথেমানুষের আচরণ ও কর্মে এটিকে প্রতিফলিত করতে বলেছেন। আর এর প্রতিফলন হলে তবেই মানুষের মুক্তির পূর্ণতা হবে। মুক্তি কেবলই ব্যক্তিগত চেতনার অবস্থান হতে পারে না; এটি হলো এমন এক অসীম উপলব্ধি, যা ব্যক্তিবিশেষ থেকে সমাজে,মানবাত্মা থেকে মানবতার মধ্যে এক সুদৃঢ় সেতুবন্ধন তৈরি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বামী বিবেকানন্দ এই মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ এক নতুন অর্থ দেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ব্যক্তিগত আত্ম উপলব্ধি এবং জীবন্ত জাগ্রত মানবিক শক্তি উপলব্ধি করে সেবারূপ কর্মই হলো মুক্তি। অতএব বলাই যায় যে," আমি" থেকে " আমরা" - র উত্তরণ হয়েছে।

(চ) বেদান্ত বিচার পদ্ধতি:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত বিচার পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। আচার্য শঙ্কর তৎকালীন সময়ের সামাজিক ধারা, মানুষের বিশ্বাস ও উদাহরণ দিয়ে বেদান্তকে সকলের সামনে উপস্থাপনা করেছেন। আচার্য শঙ্কর তার বিভিন্ন প্রকরণ গ্রন্থে ও উপনিষদ ভাষ্যে বেদান্ত বিচার বলতে কেবল শাস্ত্রবাক্যকে গুরুদেবের কাছ থেকে শুনে ন্যায়ানুসারে বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ প্রভৃতির দ্বারা বিচার করতে বলেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে এমনটা করা খুবই দুর্লভ ও কষ্টসাধ্য। আর একথা অতি অবশ্যই বলতেই হয় যে বেদান্ত বিচার করতে এত সুবিশাল বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন হলে তা সমাজের সর্ব শ্রেণীর মানুষের উপকারে বা প্রয়োজনে আসবে না। সেই রকম বেদান্ত কি করে সকলের মঙ্গল সাধন করবে? কিন্তু বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বেদান্তকে বনে বা আখড়ার মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সর্ব শ্রেণীর সকল মানুষের জীবনে প্রয়োগের কথা বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে এই বেদান্ত বিচার সকলেই করতে পারেন। এটা কেবল সন্ন্যাসীদের নিজস্ব বিষয় হতে পারে না। এই সমাজের সর্ব শ্রেণীর সকল মানুষ সবসময় এই বেদান্ত বিচার করার অতি অবশ্যই অধিকারী। বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে যুক্তি তর্ক দিয়ে এই বেদান্তকে আমাদের সামনে উপস্থাপনা করেছেন। অনেক পুরনো বিশ্বাসকে মেনে না নিয়েও বা তেমন গুরুত্ব না দিয়েও যে এই বেদান্ত বিচার করা যায় এবং বর্তমান যুগে বেদান্ত বিচার যে এখনও আমাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী তা স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সামনে প্রমাণ করেছেন।

(ছ) উপনিষদের বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যা পদ্ধতি:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে উপনিষদের মন্ত্র ব্যাখ্যার পদ্ধতিতে অতি অবশ্যই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আচার্য শঙ্কর প্রথমে উপনিষদের মন্ত্রের সাধারণ অর্থ করেছেন, তারপর ঐ মন্ত্রে ব্যাকরণগত যদি কোনো ভ্রম থাকে তাকে বৈদিক প্রয়োগ (আর্যপ্রয়োগ) বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি উপনিষদের অন্য মন্ত্রের সঙ্গে সেই মন্ত্রের পূর্বাপর সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন এবং এরপর ঐ মন্ত্রের বিরোধী মতকে খণ্ডন করে তিনি উপনিষদের সকল মন্ত্রের মূল তাৎপর্য যে ব্রহ্মাত্মৈকবোধ তা প্রতিপাদন করেছেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর সন্ন্যাসের মহান আদর্শ তথা সর্বকর্ম পরিত্যাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের উপনিষদের বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যা পদ্ধতি কিছুটা স্বতন্ত্র। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের মন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রভৃতির প্রতি বিশেষ জোর না দিয়ে তিনি প্রথমেই আরম্ভ করেছেন মানুষকে নিয়ে এবং তার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষকে বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আদর্শ হিসেবে বর্তমান যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ও নির্ভীকতার বাণী শুনিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই যে আচার্য শঙ্কর বেদের ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথম মন্ত্রটিকে ("ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং ... মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ।।") সন্ন্যাসীদের জন্য বলেছেন। আর দ্বিতীয় মন্ত্রটিকে ("কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি ... ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।) আচার্য শঙ্কর গৃহস্থদের জন্য বলেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এরূপ কোনো পার্থক্য

দেখাননি। স্বামী বিবেকানন্দের মতে আমাদের কর্ম করার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর সকল কিছু নির্ভর করছে। সকল কর্মে, চিন্তায়, বস্তুতে ঈশ্বর অতি অবশ্যই ওতপ্রোত ভাবে রয়েছেন। এরূপ ধারণা হলে বা এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল কিছু দেখলে, ভাবলে, কাজ করলে কোনো কিছু আর দুঃখের, বন্ধনের কারণ হয় না। এই মহান দৃষ্টিভঙ্গি সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ - উভয় পক্ষেতেই অতি অবশ্যই প্রযোজ্য হয়।

(জ) অদ্বৈত বেদান্তে প্রেমের ভূমিকা:-

আচার্য শঙ্কর তার মতে অদ্বৈতবেদান্তকে যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে জগতের সর্বপ্রাণীর প্রতি অসীম প্রেমের ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তার সেইরূপ বিশেষ কোনো উল্লেখ আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতে জগতের সর্বপ্রাণীর প্রতি অসীম প্রেমই হলো একমাত্র জীবন্ত জাগ্রত গতি যা জগতের সকল মানুষকে চরম একত্বের পথে নিয়ে যায়। তখন এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই চরম একত্বে মিশে যায়; এটাই হলো জীবনের মূল সূত্র। স্বামী বিবেকানন্দ তার "কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা"- তে বলেছেন-"প্রেম - একমাত্র প্রেমই আমি প্রচার করিয়া থাকি; আর আমার এই উপদেশ বিশ্বাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সমত্বরূপ বেদান্তের সেই মহান তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ।" যখন কোন মানুষ নিজেই জানতে বুঝতে পারে যে সে নিজেই যে অপর মানুষকে ভালোবাসছে সে অতি অবশ্যই আসলে সেই পরম বস্তু বা ভগবান ই, তখন এই যে পরস্পরের প্রতি প্রেম তা যথার্থ রূপ ধারণ করে।

(৭) আধুনিক ভারতীয় সমাজে আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা:-

আধুনিক ভারতীয় সমাজে আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করার ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি হলো যে কেবল তাঁদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নয়, বরং বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় তাঁদের ধারণাগুলো কীভাবে কাজ করে তার অনুসন্ধান করা। তা হলো -

প্রথমত:- আধুনিক ভারতের একটি প্রধান সংকট হলো জাতি, ধর্ম, ভাষা, শ্রেণি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পরিচয়ের বহুমাত্রিক বিভাজন। এই প্রেক্ষাপটে, আমি শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকে একটি “সত্তাতাত্ত্বিক ঐক্যকারী” হিসেবে দেখতে পাই। তাঁর মতে, সমস্ত বহুত্বের মূলে একটিই পরম সত্তা রয়েছে। এই উচ্চ ভাবনাটি আজকের আধুনিক সমাজে একটি দার্শনিক প্রতিষেধক ঔষধ হিসেবে কাজ করতেই পারে, কারণ এটি মানুষকে বাহ্যিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে উৎসাহিত করে। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যদি এই ঐক্যের অনুভূতি কেবল চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সামাজিক বাস্তবতায় প্রতিভাত না হয়, তবে তা প্রকৃত পরিবর্তনের হাতিয়ার না হয়ে একটি “বিমূর্ত আশ্বাস” হয়ে কেবল দাঁড়াবে।

দ্বিতীয়ত- এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি আচার্য শঙ্করের এই " সত্তাতাত্ত্বিক ঐক্য" - কে “নৈতিক সক্রিয়তাবাদ”-এ রূপান্তরিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দের "কর্মযোগ' ও ‘জীব সেবা’র ধারণা হলো প্রধানত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনেরই একটি সামাজিকীকরণ। আধুনিক ভারতে যেখানে উন্নয়নকে প্রায়শই অর্থনৈতিক সূচকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা আধুনিক উন্নয়নকে মানব মর্যাদা, সুশিক্ষা এবং আত্মোন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করে। আমার মতে, এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক

উন্নয়নের জন্য আদর্শিক কাঠামো - যেখানে উন্নয়ন বলতে শুধু জিডিপি বৃদ্ধিকে বোঝায় না, বরং মানুষের সার্বিক উন্নয়নকে বোঝায়।

তৃতীয়ত:-ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রেক্ষাপটে এই দুই অসামান্য চিন্তাবিদের প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে উঠে আসে। দার্শনিক স্তরে, আচার্য শঙ্কর সবকিছুকে একত্বের মধ্যে বিলীন করার কথা বলেন - যা এক ধরনের অধিবিদ্যামূলক অন্তর্ভুক্তিবাদ। কিন্তু এই অতি আধুনিক সমাজের জন্য এখন প্রয়োজন "সংলাপমূলক বহুত্ববাদ" - যেখানে বৈচিত্র্য বজায় রেখেও সহাবস্থান সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অবস্থান অধিক কার্যকর, কারণ তিনি বিভিন্ন ধর্মমতকে পৃথক পৃথক পথ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তি গঠন করেন। তাই বলা যেতে পারে যে শঙ্কর "সত্যের একত্ব"-কে একটি বাস্তব রূপ দিয়েছেন, অপরদিকে স্বামী বিবেকানন্দ "বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব"-কে বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

চতুর্থত:-তাঁদের চিন্তাধারা আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান প্রদান করে। আচার্য শঙ্কর প্রাচীন জ্ঞানকে পুনর্গঠন করেছিলেন, আর স্বামী বিবেকানন্দ সেই গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকে মানবিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুনরায় বিশদে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সমসাময়িক ভারতে, যেখানে পাশ্চাত্য আধুনিকতা প্রায়শই সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, সেখানে এই দুই সুন্দর চিন্তাধারার সংমিশ্রণে একটি সাংস্কৃতিকভাবে গভীর আধুনিকতার গঠন সৃষ্টি করা যায় - যা এই অতি আধুনিক যুগে খুব-ই প্রয়োজন।

(৮) গবেষণা ফলাফল:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় দর্শন চিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে এই গবেষণায় কিছু মৌলিক দিক উঠে এসেছে।

প্রথমত - তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনপদ্ধতি ও ব্যক্তিত্ব তাঁদের দার্শনিক অবস্থানকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করেছিল। আচার্য শঙ্করের জীবন যেখানে ছিল তাত্ত্বিক, সংযত ও বুদ্ধিবৃত্তিক, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ছিল অভিজ্ঞতাভিত্তিক, অসীম গতিশীল ও মানবকেন্দ্রিক। এই পার্থক্য তাঁদের চিন্তাধারায় সাধারণভাবে যথাক্রমে বিমূর্ততা ও বাস্তবমুখী রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে, এই গবেষণাটি দেখায় যে দর্শনভাবনা কেবল বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার ফল নয়, ব্যক্তিগত জীবনের এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক অভিব্যক্তি-ও।

দ্বিতীয়ত - আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতীয় দর্শন-ভাবনা বিষয়ে একটি কাঠামোগত পার্থক্য চিহ্নিত করা যায়। আচার্য শঙ্কর প্রাচীন অদ্বৈত বেদান্তকে একটি সুসংহত তাত্ত্বিক ব্যবস্থা হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে পরম সত্যের একত্বই হলো মূল কথা। অপরদিকে, স্বামী বিবেকানন্দ এই অদ্বৈত বেদান্তকে জীব তথা মানব জীবন, সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও অসীম কর্মযজ্ঞের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার একটি প্রায়োগিক ব্যাখ্যা আমাদের জন্য প্রদান করেন। তাই আমাদের অতি অবশ্যই বলতে হবে যে 'তত্ত্ব-নির্মাণ' এবং 'তত্ত্ব-প্রয়োগ' - এই দুই দার্শনিক ধারাকে একত্র করে আমাদের অতি অবশ্যই চলতে হবে।

(৯) গবেষণা সীমাবদ্ধতা:-

আলোচ্য বিষয়ে কিছু গবেষণা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেগুলি হলো –

(ক) ব্যাখ্যামূলক নির্ভরতা:-

এই গবেষণায় আচার্য শঙ্কর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শন চিন্তাধারার বিশ্লেষণ মূলত তাত্ত্বিক ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। ফলে, গবেষকের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব হয়নি।

(খ) গবেষণার পরিধির সীমাবদ্ধতা:-

এই গবেষণাটি আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্ব এবং ভারতীয় দর্শন চিন্তার উপর আলোকপাত করে; এখানে সমাজ ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ফলে, এই বিষয়টির ব্যাপকতা আংশিকভাবে সীমিত থেকে যায়। তবে আমি পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ও নৈতিক দর্শন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

(গ) জীবনীমূলক তথ্যের অনিশ্চয়তা:-

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্য মূলত ঐতিহাসিক বিবরণ ও তার ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল, যা সবসময় নির্ভুল বা নিরপেক্ষ নাও হতে পারে। ফলে, বিশ্লেষণে কিছু অনিশ্চয়তা থেকে যেতেই পারে।

(১০) উপসংহার:-

আলোচ্য গবেষণা পত্রে আচার্য শঙ্কর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় দর্শন চিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে ভবিষ্যতে গবেষণা করা যেতে পারে; যেমন - (১) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।(২) ধ্রুপদী অদ্বৈত ও ব্যবহারিক বেদান্ত নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। (৩) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দকে অন্য ভারতীয় বা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সঙ্গে তুলনা করে একটি বিস্তৃত গবেষণা করা যেতেই পারে। (৪) আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে রচনা বিশ্লেষণ করে নতুন কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা বের করা যেতেই পারে। দর্শনভাবনা কেবল বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার ফল নয়, তার সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবনের এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক অভিব্যক্তি-ও। আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ - এই দুই মহর্ষির চিন্তাভাবনাকে পরস্পরবিরোধী হিসেবে দেখার পরিবর্তে সেগুলোকে একটি সমন্বিত দার্শনিক প্রবাহের দুটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বিবেচনা করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। আচার্য শঙ্করে সেখানে দর্শনের মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আর স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভিত্তিকে একটি জীবনমুখী ও ব্যবহারিক রূপদান করেছেন। সুতরাং, আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে যে মূল ধারণাটি উঠে আসে তা হলো, তাত্ত্বিক গভীরতা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ - এই পারস্পরিক সমন্বয়ের মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

- কুণ্ডু, শিখা। অদ্বৈত বেদান্তী স্বামী বিবেকানন্দ। কৃষ্ণগঞ্জ দেববাণী মন্দির, ১৯৫৮

- ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ। আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২১
- পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী। যুগদিশারী বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২১
- পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী। স্মৃতির আলোয় স্বামীজি। উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪
- মাধবানন্দ, স্বামী (অনুবাদক)। ঈশোপনিষদ (শঙ্কর ভাষ্যসহ)। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৫০
- মাধবানন্দ, স্বামী (অনুবাদক)। বৃহদারণ্যক উপনিষদ। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৫০
- শর্মা, বাসুদেব। ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্। চৌখাম্বা বিদ্যা ভবন, ২০১৭
- বিবেকানন্দ, স্বামী। The Complete Works of Swami Vivekananda, খণ্ড - ৭। সম্পা. স্বামী পবিত্রানন্দ। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৭
- বিবেকানন্দ, স্বামী। The Complete Works of Swami Vivekananda, খণ্ড - ৮। সম্পা. স্বামী যোগেশ্বরানন্দ। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৭